সিজোফ্রেনিয়াঃ
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর করার আছে অনেক কিছু

এম মুখলেছুর রহমান

সুমন (প্রকৃত নাম নয়) ২৮ বৎসর বয়সী একজন শিক্ষিত যুবক। সে তার মা-বাবার চার সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। তার বড় ভাই-বোনেরা শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত। যথারীতি তাকে নিয়েও বাবা-মার আশা, ছেলে পড়ালেখা করে মানুষের মতো মানুষ হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু, মাস্টার্স পাস করার পর থেকেই তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। ধীরে ধীরে সে সবার সঙ্গে কথাবার্তা কমিয়ে দিল। কারও সাথে মিশে না, ঠিকমতো খায় না, ঘরের বাইরেও তেমন যায় না, গেলেও কাউকে কিছু বলে যায় না। চুপচাপ থাকে। মাঝে মাঝে একা একা কথা বলে। আশে পাশে কী ঘটল না ঘটল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। একদিন হঠাৎ করে সে উধাও হয়ে গেল। কোথাও তার কোন হদিস নেই। নেই তো নেই। কোন আত্মীয়, বন্ধু, কারও বাসায় নেই। কেউ তার কোন খোজ দিতে পারল না। কয়েক মাস পর সুমনের দেখা মিলল ঢাকার একটি ব্যস্ত এলাকার এক ডাস্টবিনে। সে সেখানেই থাকে। তার আত্মীয়-স্বজন কাউকে সে চিনে না। ডাস্টবিন থেকে সে আসতেও চায় না। সে বলে ডাস্টবিন-ই তার বাড়ি।

অবশেষে কয়েকজন মিলে জোর করে ধরে নিয়ে আসল সুমনকে। কোন রকমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে তাকে ভর্তি করা হল ঢাকার একটি নাম করা হাসপাতালের মানসিক বিভাগে। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর তার সাথে কথা বলে জানা গেল, সে নবি হয়ে গেছে। আল্লাহ সরাসরি তার সাথে কথা বলেন। মানুষের মাঝেই অন্যান্য নবি, ওলি এবং ফেরেশতারা অদৃশ্য হয়ে চলাফেরা করেন। কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু সে দেখতে পায়। তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন কেউ তার বিষয়গুলো বুঝে না। আর তাই তাকে জোর করে আটকে রেখে কোন লাভ হবে না। সে আবারও চলে যাবে।

মানসিক চিকিৎসক বা সাইকিয়াট্রিস্ট (Psychiatrist) তাকে সিজোফ্রেনিক (Schizophrenic) বা সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হিসাবে চিহ্নিত করলেন।

এটা অনেকেই জানেন যে, মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই সিজোফ্রেনিয়া মানুষকে নানাবিধ সন্দেহে ভুগিয়েছে। যেমন প্রথমে মনে করা হতো যে উদ্ভট আচরণকারী ব্যক্তিটির উপর দুষ্ট আত্মা বা ডাইনি ভর করেছে বা শয়তান তাকে বশ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে ঐ মানুষটিকে তার আশেপাশের মানুষরা ভয় পেত, বন্দী করে রাখত, এমনকি দুষ্ট আত্মা বিনাশ করার লক্ষে পুড়িয়ে মেরে ফেলত, কখনো কখনো চরকা লাগিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখত।

এই একবিংশ শতাব্দীতেও, সিজোফ্রেনিয়ার কারণ, প্রকৃতি এবং চিকিৎসায় নানা উন্নতি সাধিত হওয়ার পরও, চিকিৎসক, সাধারণ মানুষ সকলেই চমকে যায় সিজোফ্রেনিয়ার নাম শুনে।

ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেও মানুষ তা মেনে নিতে পারে, কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার কথা কেউ মেনে নিতে চায় না। সিজোফ্রেনিকের (সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির) উদ্ভট আচরণ, অলীক প্রত্যক্ষণ (Hallucination) এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস (Delusion)-কে অনেকেই ভুল বুঝেন।

অন্যান্য অনেক মানসিক রোগের মতো সিজোফ্রেনিয়ার কারণ সম্পর্কিত ধারণাও সীমিত ও অবহেলিত। যদি কেউ জানতে পারে যে তার আত্মীয়, বন্ধু বা পরিবারের কেউ সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে তাহলে তারা ভীত, সন্ত্রস্ত, মর্মাহত, এমনকি রাগান্বিত হয়ে যায়। তারা ধরেই নেয়, সিজোফ্রেনিক মানেই আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসাত্মক আচরণ করবে বা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলাফেরা করবে। অথচ অন্য অনেক জটিল মানসিক রোগেও এরকমটা ঘটতে পারে এবং সিজোফ্রেনিকের ক্ষেত্রে নাও ঘটতে পারে। এর মূলে রয়েছে সিজোফ্রেনিয়া সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল এবং ভিত্তিহীন ধারণা ও কুসংস্কার।

তবে হ্যাঁ, চিকিৎসা না হলে সিজোফ্রেনিয়া রোগ আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তার আশেপাশের মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। সিজোফ্রেনিকের অদ্ভুত, অসংলগ্ন আচরণ তাদের জীবনযাত্রাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে।

সিজোফ্রেনিয়া প্রধানত ব্যক্তির চিন্তা করার ধরনকে প্রভাবিত করে। সিজোফ্রেনিক যুক্তিসঙ্গতভাবে তার পারিপার্শিকতাকে যাচাই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সে এমন কিছু দেখে, শুনে বা অনুভব করে বাস্তবে যার কোন অস্তিত্বই নেই। এর সাথে বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাসও থাকতে পারে। যার ফলে তাদের আচরণ হয়ে উঠে উদ্ভট এবং অসংলগ্ন। যে কেউই সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে যে কেউ সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে।

সাধারণত দেখা যায়, কৈশোরের শেষ দিকে বা যৌবনের শুরুতে সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। নিকটজনেরা রোগ নির্ণয়ের অনেক আগেই সাধারণত এসব লক্ষণ টের পায়। তখনও রোগীটি সম্পূর্ণরূপে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যায় না। এ সময়ে ঔষধের পাশাপাশি সাইকোথেরাপি নিতে পারলে সিজোফ্রেনিয়া নিরাময় এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব।

এই শুরুর সময়টাতে (Prodomal Phase) দেখা যায়, রোগীরা জীবনের লক্ষ হারিয়ে ফেলছে, দিনে দিনে অদ্ভুত আচরণ বা কথা বলা শুরু করেছে এবং কোন কাজেই আর আগ্রহ খুজে পাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে এরা আরও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে থাকে। পরিবার, আত্মীয়, বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা কমিয়ে দেয়, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি থেকে দূরে থাকে, নিজেকে গুটিয়ে রাখে প্রভৃতি। এমনকি শখের কাজগুলো থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

নিচে কিছু লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হলো যা দেখে বুঝা যেতে পারে ব্যক্তি সিজোফ্রেনিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে:

- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা;
- অযৌক্তিক, অমূলক এবং অদ্ভুত ধরনের বিবৃতি বা বিশ্বাস;
- সন্দেহপ্রবণতা বা অন্যের প্রতি সন্দিগ্ধতা বৃদ্ধি;
- ধীরে ধীরে আবেগশূন্য হয়ে যাওয়া;
- আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক আচরণ;
- নিজে নিজেই ওষুধ সেবন (মাদক নির্ভরশীলতা তৈরি);
- কাজ-কর্মে আগ্রহের অভাব;
- অদ্ভুতভাবে কথা বলা;
- হঠাৎ এবং অসংলগ্ন হাসি;
- ব্যক্তিগত বেশভূষা এবং পরিচ্ছন্নতার ক্রমাবনতি ইত্যাদি। (DSM V & ICD 10)

উপরোক্ত লক্ষণসমূহের মধ্যে দু-একটি লক্ষণের বহিঃপ্রকাশ সিজোফ্রেনিয়ার পূর্বলক্ষণ নাও হতে পারে। তবে বেশ কয়েকটি লক্ষণ যদি একই সঙ্গে প্রকাশ পায় তবে তা অবশ্যই বিবেচ্য।

সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞানীর করণীয়

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক পেশাজীবিই রোগীদের অভিভাবকদের মতো অসহায় বোধ করেন। এর কারণও আছে -- ঘন ঘন রিল্যাপ্স করা, মানসিক রোগীদের শারীরিক রোগীদের মতো মনে করা, সামান্য উন্নতি দেখলেই ঔষধ বন্ধ করে দেওয়া, প্রভৃতি। তারা ভুলেই যান যে, এ রোগীদের জন্য লম্বা সময় ধওে, এমনকি আজীবন, স্বল্প মাত্রায় ঔষধ খেয়ে যেতে হবে এবং চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। এমনকি অনেক চিকিৎসকও হাল ছেড়ে দেন যে, আর কত!

কিছু কিছু চিকিৎসক বলেই বসেন যে, সিজোফ্রেনিকদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানীদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। এটা আবার ফলাও করে প্রচারও করা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার টকশোতে বসেও কিছু কিছু মনোবিজ্ঞানী তীব্র মানসিক রোগের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকা নিয়ে নিজেরাই বিভ্রান্তিমূলক কথা বলেন। কোন কোন সময় শোনা কথায় কান দিয়ে অনেক চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানীরও 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। প্রশ্ন হলো, কেন এমন হয়?

আগেই বলেছি, সিজোফ্রেনিয়া আসলে দীর্ঘসূত্রী (Chronic) এবং রিল্যাপ্সিং কেস। এই ভালো তো এই মন্দ। মাঝে মাঝে দেখা যায় বেশ উন্নতি হয়েছে। পরক্ষণেই উৎপাত শুরু হয়ে যায় আবারও। যার জন্য সিজোফ্রেনিয়াকে স্প্লিট মাইন্ড (Split Mind) বলা হয়ে থাকে। ভালো মন যখন কাজ করে তখন রোগী স্বাভাবিক আচরণ করে। অসুস্থ মন যখন কাজ করে তখনই বেঁধে যায় গণ্ডগোল। আর এটা যারা দক্ষতার সাথে সামাল দিতে/মানিয়ে নিতে পারে তাদের রোগীদের ভালো থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেড়ে যায়।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা যুগ যুগ ধরে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে আসছে বিভিন্ন অপপ্রচার, কুসংস্কার আর নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণার কারণে। প্রাচীনকালে এতসব মানসিক রোগের মধ্যে কেবল হিস্টিরিয়া আর সিজোফ্রেনিয়া নিয়েই বেশি আলোচনা-সমালোচনা আর চিকিৎসার কাহিণী ও প্রমাণ পাওয়া যায়। কখনো একা ঘরে আবদ্ধ রেখে, নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত করে, এসাইলামে বন্দী করে, পানিতে ডুবিয়ে, মাথার খুলি ছিদ্র করে শয়তান তাড়ানোর মাধ্যমে, তাড়াতাড়ি মেয়ে সঙ্গী যোগাড় করে দিয়ে বা বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, আরো কত কি...

এভাবেই মানসিক রোগ ও তার চিকিৎসার ইতিহাস আজকের এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত এসেছে। তবে একটা দিক সুস্পষ্ট যে মানসিক রোগের চিকিৎসার বহুমুখী উন্নতির গোড়াপত্তন আর চিকিৎসকদের মাঝে বেশি থেকে বেশি পেরেশানি তৈরি করার পেছনে সিজোফ্রেনিয়া বা সাইকোসিসজনিত সমস্যার বিষয়টি বেশি।

বর্তমান সময়েও সিজোফ্রেনিয়া বা সাইকোসিস চিকিৎসা নিয়ে হতাশার অন্ত নেই। ঠিক একইভাবে সঠিক ধারণার ঘাটতি ও যথাযথ উদ্যোগের অভাবও লক্ষণীয় মাত্রায় দেখা যায়।

চিকিৎসাকালীন ও চিকিৎসা-পরবর্তী (Residual Phase) সেবার ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী বা প্রশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকা খুবই বেশি। বিশেষ করে:

- পারিবারিক চিকিৎসা (Family Therapy/Family Intervention);
- ব্যক্তিগত ও দলভিত্তিক আচরণ ব্যবস্থাপনা (Group and individual-based behavioral management programs);
- বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা প্রশিক্ষণ (Skill Training), যেমন সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ (Social Skill Training)। গবেষণায় দেখা গেছে, সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জনে টোকেন ইকোনমি এবং রিইনফোর্সমেন্ট বা বলবর্ধক টেকনিক বেশ কার্যকর;
- স্বাভাবিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো;
- ডিলিউশন (Delusion) ও হ্যালুসিনেশন (Hallucination) ম্যানেজমেন্ট;
- ভ্রান্ত চিন্তা সংশোধনমূলক পদ্ধতি (Modification of Cognitive Impairment);
- সাইকোসোশ্যাল রিহ্যাবিলিটেশন (Psychosocial Rehabilitation) ইত্যাদি।

উপরোক্ত মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বর্তমান দশকে চিকিৎসক ও গবেষকগণ সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতা লাভ করছেন। যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে (ডেভিড জি. কিংডন ও তার সঙ্গীরা)। তীব্র লক্ষণসমূহ চলে যাওয়ার পর (after chronic

phase) বলা চলে একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকাই বরং বেশি। এ পর্যায়ে (residual phase) মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি গ্রহণ করার মাধ্যমে একজন সিজোফ্রেনিক রোগীর পুনরায় রোগাক্রান্ত (Relapse) হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

একজন রোগী সুস্থ করা মানে কেবল তার রোগের লক্ষণগুলি কমানো নয়, বরং রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের কিছু বিষয়ের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়াও বটে। যেমন অপর্যাপ্ত ও অনাকাঙ্খিত আবেগ নিয়ন্ত্রণ (Expressed Emotion), ভ্রান্ত বিশ্বাস (Delusion), হঠাৎ সঠাৎ অলীক প্রত্যক্ষণ (Hallucination), রোগের কারণে ব্যক্তিগত বিভিন্ন দক্ষতার অভাব, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পারিবারিক চিকিৎসা (Family Therapy/Family Intervention) পদ্ধতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ।

বর্তমানে সাইকোথেরাপিস্টগণ সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে সিবিটি (CBT), সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি (Supportive Psychotherapy) প্রয়োগে সাফল্য লাভ করেছেন এবং এ ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতির ধীরে ধীরে উন্নতি সাধন করছেন।

সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসায় চিকিৎসক ও অভিভাবকদের যথেষ্ট ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে সম্মিলিতভাবে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে, পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাওয়াটা জরুরি। সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে চিকিৎসা চালিয়ে গেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আজকাল চিকিৎসাসেবায় রোগীদের সময় দেওয়া নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। সিজোফ্রেনিয়া বা সাইকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি অনেক বেশি বিরক্ত করে বলে তাদেরকে এড়িয়ে চলার মনোভাব দেখা যায়। অসংলগ্ন আচরণকে অনেকেই ভয় পায়, বিব্রতবোধ করে বলে এ নিয়ে আগ্রহ-উদ্দীপনার অভাব কাজ করে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীরা তাদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে উপরে বর্ণিত চিকিৎসাপদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে যথেষ্ট সফল ভূমিকা রাখতে পারেন।

সূত্র

- Carr, A., McNult, M., (2006). The Handbook of Adult Clinical Psychology An Evidence-Based Practice Approach. Edition: 1st, London & New York; Routledge. Birchwood, M., Tarrier, N., (1995). Psychological Management of Schizophrenia. Edition - 1st, Chichester; John Wiley & Sons.
- Kingdon, D. G., Turkington, D., (2000). Cognitive Behavioral Therapy of Schizophrenia. Edition - 1st, United Kingdom; Psychology Press.

বি এস সি অনার্স, এম এস সি (সাইকোলজি), এমএস, এমফিল পার্ট-II (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি), পিজিটি (সাইকোথেরাপি), বএসএমএমইউ; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আলফা স্পেশালাইজড হাসপাতাল, যশোর; সেক্রেটারি জেনারেল, আলফা ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ